Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বুদ্ধদেব বসু-র কালসন্ধ্যা : সৃষ্টি-ধ্বংস-পুনরুজ্জীবনের শিল্প

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tarana Nupur
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.8
Pages	১২৭-১৫৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪১৮ ॥ অক্টোবর ২০১১

বুদ্ধদেব বসু-র *কালসন্ধ্যা* : সৃষ্টি-ধ্বংস-পুনরুজ্জীবনের শিল্প

Check for updates

তারানা নূপুর*

এক

ক্রমাগ্রসর যান্ত্রিকতায় আধুনিক মানুষের চেতনার শাসন ও শুশ্রূষায় মিথ যেমন এক আশ্চর্য বিশল্যকরণী, তেমনি কাব্যনাটকও আধুনিক শিল্পের বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসার অনন্য সমন্বয়ক এক মাধ্যম — যেখানে বস্তুজগৎ ও চেতনাজগৎ, আবেগ-অনুভূতি ও দ্বন্দ্ব-সংকট, দৃশ্যলোক ও শ্রুতিলোক পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর পরিপূরক।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম কাব্যনাটক ও মিথ একাত্ম হয় টি.এস. এলিয়টের (১৮১৮-১৯৬৫) সূত্রে। 'ঐতিহ্য' ও 'কাব্যনাটক' — দুটি বিষয় নিয়েই তিনি গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন এবং দুয়ের সংযোগে আধুনিককালে শিল্পের নতুন মাত্রা ও সম্ভাবনাকে সূচিত করেন তাঁর *Murder in the Cathedral* (১৯৩৫), *The Family Reunion* (১৯৩৯), *The Cocktail Party* (১৯৪৯) প্রভৃতি রচনায়। একই শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটককে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেন ঐশ্বর্য ও উৎকর্ষের নানা মাত্রিকতায়, তিনি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) । স্বাধ্যায় ও সৃষ্টিশীলতার গভীর সামঞ্জস্যে নির্মিত তাঁর মৌলিক পাঁচটি মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটক — *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০) *প্রথম পার্থ* (১৯৭০) ও *সংক্রান্তি* (১৯৭৩)।

শিল্পসাহিত্যে মিথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যিকদের সাথে বুদ্ধদেব বসুর সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানে যে, অন্যরা সমকালকে মুখ্য বিবেচনায় রেখে পুরাণের প্রচ্ছদমাত্র গ্রহণ করেন আর বুদ্ধদেব পুরাণ থেকে অর্জন করেন বাস্তব জ্ঞান এবং সমকালের সাথে তার বহমানতাকে যুক্ত করে একটি বৃহৎ জীবন-চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, মহাভারত 'কোনো সুদূরবর্তী ধূসর, স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান।'[১] ফলে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে এই প্রবহমান জীবন-অস্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটে অবরোহ পদ্ধতিতে, যা অন্যান্য শিল্পীর ক্ষেত্রে সাধারণত আরোহী। তাঁর মিথ চেতনা আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী নয়, বরং একটি ধারাবাহিক বিবর্তনমূলক সত্তায় আস্থাবান — জীবনের একটি পুরাবৃত্ত সৃষ্টিতে আগ্রহী।

দুই

মহাভারতের 'মৌষলপর্বে'র দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংসের বর্ণনা থেকে আহৃত বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* নাটকের আখ্যান। এ নাটকে বুদ্ধদেব বসু অবলম্বন করেন ভয়াবহভাবে সংঘটিত 'একটি সম্পূর্ণ সভ্যতার ধ্বংস' এবং 'মানুষিক বুদ্ধি ও চেতনার সার্বিক ও প্রতিকারহীন নির্বাপণ।'[২] চলমান সভ্যতায় কখনো কখনো নামে আকস্মিক ছন্দঃপতন।

---

*প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল।

সভ্যতাকে রক্ষার প্রয়োজনেই তখন ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংহারক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মহাকাল। তখনই পৃথিবীতে নামে কালসন্ধ্যা। বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্যে —

> বিরতিরও প্রয়োজন ঘটে মাঝে-মাঝে, আসে মাঝে মাঝে সন্ধিলগ্ন যখন কালের ঘূর্ণন যেন মুহূর্তের জন্য থেমে যায় — যখন সব যুদ্ধ সমাপ্ত, সব উদ্যম নিঃশেষ, পৃথিবীর বীর বংশ লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়, কোথাও নেই কোনো সংকট বা সংঘর্ষ, এবং কোনো নতুন সূচনারও ইঙ্গিত নেই। আসে এমন সময়, যখন 'সংগ্রহ' ও 'সংহার' সমার্থক হ'য়ে ওঠে, পূর্ণ হয় কোনো-এক বৃত্ত, বিশ্ব সংসারে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই প্রয়োজন ঘটে ধ্বংসের।[৩]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছত্রিশ বছর নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হবার পর পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকায় নামে এইরকম একটি সন্ধিক্ষণ। আর পৌরাণিক সেই ধ্বংস-কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অন্তশ্চালিত করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক অবক্ষয়, জীবনের অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধের বিপন্নতা, ব্যক্তির নিঃসহায়তা এবং তার দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য-সংঘাতের বাস্তবতা। আধুনিক কবি যাকে বলেছেন 'অশ্লেষার রাক্ষসীবেলা', আদিকবি যাকে বলেছেন 'কালবিপর্যয়নিবন্ধন', বুদ্ধদেব বসু তাকেই বলেন 'কালসন্ধ্যা' এবং যে দর্শনটি দ্বারা এই ত্রিকাল এক বিন্দুবদ্ধ হয়, তা হলো সুবৃহৎ কালচেতনা। তাই বুদ্ধদেব বসু নাটকের ভূমিকাতেই এর ব্যাপ্তি নির্দেশ করেন — 'বলা বাহুল্য, দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহুদূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব- ইতিহাসের একটি আদিসত্য বিরাজমান।'[৪] বুদ্ধদেব উল্লেখিত এই আদিসত্য বা রিচ্যুয়াল, যা আজও প্রবহমান এবং রূপান্তরিতভাবে ভবিষ্যতেরও অলিখিত নির্বন্ধ, তা হলো বিপুল, ব্যাপ্ত, নির্মোহ, নির্দ্বিধ, সুমহান কাল — যা প্রত্যক্ষের অতীত অথচ সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক — সভ্যতার রক্ষা, ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবন যার অধীন — একই সাথে 'লোকসংগ্রহ' ও 'লোকসংহার' যার কর্ম, সেই প্রবৃদ্ধ কাল, *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণ যার মানবমূর্তি।

কালসন্ধ্যা নাটকে যদুবংশের ধ্বংসকে বুদ্ধদেব বসু কোনো আকস্মিক বিপর্যয়রূপে চিহ্নিত করেননি, বরং তাকে অবশ্যম্ভাবী সত্যের সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতরূপে উল্লেখ করেন। এই ধারাবাহিকতা একদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্মৃতিতে অতীতস্পর্শী, অপরদিকে তা ভাবীকালের সম্ভাব্য সত্যরূপে দূরপ্রসারী। কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের দুই যুগ পর সংঘটিত দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস এ নাটকের প্রেক্ষাপট। *মহাভারত* অনুসারে এ সংঘটন গান্ধারীর অভিশাপ কিংবা নারদ ও কণ্বমুনির ব্রহ্মশাপের ফল বলে বিবেচিত হলেও এ নাটকে সেসব প্রতীকী মূল্য বহন করে মাত্র। *কালসন্ধ্যায়* যদুবংশের ধ্বংস কোনো নিয়তি-নির্ধারিত বিষয় নয়, বরং ঘটমান বাস্তবতারূপে চিত্রিত। এরকম একটি ভয়াবহ বিপর্যয় সাধনের সমস্ত কার্যকারণ এখানে উপস্থিত — সমুদ্র গর্জনে, আকাশে কালোমেঘের সংকেতে, দুর্যোগের পূর্বাভাসে, দ্বারকাবাসীর পরস্পর কলহে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ও বিলাসমত্ততায়। 'পূর্বরঙ্গে' দুই বৃদ্ধের কথোপকথনে দ্বারকাপুরীতে প্রথম শঙ্কা ও দুর্লক্ষণের প্রসঙ্গ আসে। কারণ, তারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আর বীভৎস অতীতকে ভুলে উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের আশায় ক্ষীণজীবী। কিন্তু তাদের সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে 'চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান' — ঠিক যেমন বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভস্মস্তূপ থেকে জ্বলে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন, মাত্র একুশ বছরের

ব্যবধানে। মূলত 'মৌষলপর্ব'কে বুদ্ধদেব বসু মনে করেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এক সংক্ষিপ্ত অনুবৃত্তি, এক উপসংহার — "মৌষলপর্ব'টি কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের এক সংক্ষেপিত ও ভীষণতর পুনর্লিখন অথবা এক মর্মভেদী মন্তব্য, সেই দীর্ঘায়িত ঘটনাবলির সারাৎসার — তার ব্যাখ্যা, তার সর্বশেষ পরিণাম।"[৫] অর্থাৎ 'মৌষলপর্ব'টি মহাকালের একটি অসম্পূর্ণ নাট্যের শেষাংশ। ফলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্মৃতি দ্বারকাবাসীর মধ্যে এক স্নায়বিক বিভীষিকা নিয়ে তখনো বর্তমান, তাদের অস্তিত্ব থেকে তা অমোচনীয়। দিনরাত অসংখ্য অভিশাপ তাদের তাড়িত করে ফেরে। যারা জীবিত, তারা যন্ত্রণার পুনর্জন্ম থেকে বিস্মরণপ্রার্থী। এক অনমনীয় পাপবোধে তারা মানসিকভাবে আক্রান্ত। ফলে ভ্রান্তি, অধ্যাস, দুঃস্বপ্ন তাদের স্বাভাবিক জীবনকে করে তোলে বিপর্যস্ত। বিশুদ্ধ অন্নে তারা প্রত্যক্ষ করে অগণিত কীট, দুঃস্বপ্নে অনুভব করে মুষিক-দংশন, ছাগলের ডাকে তারা শোনে শৃগালের অশুভ চিৎকার। এইসব দুঃস্বপ্নকে ভুলে থাকার মরিয়া প্রয়াসে তারা নিমজ্জিত হয় নির্লজ্জ কামোল্লাসে ও মদমত্ততায়। নগরে, প্রভাসতীর্থে নারী-পুরুষ পরস্পর লিপ্ত হয় অজাচারে আর অপরিমেয় মদ্যপানে। আর যারা নির্বিকার এবং নির্বিচারী নয়, তারা ভীত প্রতিহিংসার ভয়ে।

সুভদ্রার আশঙ্কায় —

সুভদ্রা

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হ'লে
বিধবার আর্তনাদ, মাতার ক্রন্দন,
ভীষ্মের অনুশাসন, মৈত্রীর স্বাক্ষর :
তারপর অশ্বমেধ, বানপ্রস্থে গেলেন বৃদ্ধেরা,
কেটে গেলো ছত্রিশ বৎসর।
তবুও কি স্থিতি নেই — ক্ষমা নেই?
তবু — প্রতিহিংসা?

ক্রমশ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ করে যদুকুলের মধ্যে প্রজ্বলিত হয় হননস্পৃহা। মদিরার উত্তুঙ্গ চূড়ায় সাত্যকি উল্লেখ করে কৃতবর্মা কর্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের হননের নির্মম ইতিহাস। নিন্দারোষে প্রজ্বলিত কৃতবর্মা, স্মরণ করিয়ে দেয় সাত্যকি কর্তৃক ছিন্নবাহু, ধ্যানমগ্ন ভূরিশ্রবার হননের নৃশংসতা। এভাবে তাদের অবচেতনে রক্ষিত পূর্বপাপ উন্মোচিত হয়, পুরোনো ক্ষোভ উন্মথিত হয় নতুন করে, তিক্ত হয় কলহ। সাত্যকি-কৃতবর্মা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিপরীত পক্ষের দুই অবশিষ্ট সৈনিক, হত্যা করে পরস্পরকে। ক্রমশ এই জিঘাংসার আগুন ব্যাপ্ত হয় দ্বারকাপুরীর সর্বত্র। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকেরা নির্বিচারে জ্ঞাতিক্ষয়ের অন্ধ উন্মাদনায় মাতে। কৃষ্ণের কবিত্বময় প্রেক্ষণে —

কৃষ্ণ

বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকেরা আরম্ভ ক'রে দিলেন
নির্বিচারে পরস্পরে অস্ত্রাঘাত।
প্রদ্যুম্ন, রুক্মিণীপুত্র, অচিরাৎ ধুলায় লুটালো।
হত শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ
ইত্যাদি জ্ঞাতিরা — দ্রুত — পরস্পর কিংবা যুগপৎ —

যেন ঝরে শুকনো পাতা অবিরল চৈত্রের বাতাসে,
অথবা ঝঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম।
পিতা করে পুত্রের মস্তক চূর্ণ, পুত্র মাখে পিতার শোণিত অঙ্গে,
কেউ হানে নিজের কণ্ঠেই খড়্গ।

কালসন্ধ্যা নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক শুরুর পূর্বেই এই ভয়াবহ জিঘাংসাকৃত্য সমাপ্ত হয়। কৃষ্ণ হন্তারক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে ত্বরান্বিত করেন। তাঁর হাতে তুলে নেয়া তৃণ পরিণত হয় বেগবান বজ্রতুল্য মুষলে, মুহূর্তে নিঃশেষ হয় যদুবংশ। কৃষ্ণের এই লোকক্ষয়কারী ঈশ্বরত্বের অন্তরালে বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেন 'এক ভূষণরিক্ত জীবনক্লান্ত পুরুষকে', এক বৃদ্ধ কাণ্ডারীকে, যিনি তাঁর কুল-ধ্বংসের উন্মাদনায় নির্লিপ্ত দর্শক — যদুবংশের নৈতিক অবক্ষয়ে তিরস্কারোদ্যত নন, তাদের পতনেও নির্মোহ, উদাসীন, অনুগ্র এক দার্শনিকের মতো। কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী কৃষ্ণই মহান কালাবতার। নিজের সেই মহাকালরূপী কালান্তক সত্তাকে তিনি উপলব্ধি করেন দ্বারকাপুরীর এই প্রলয়ংকরী সন্ধ্যায়, তা ব্যক্ত করেন অর্জুনের নিকট —

কৃষ্ণ

তবু — সেই অনুভূতি! — যেন এক সত্তা আছে,
অন্য কিছু নেই, আছে একমাত্র সেই সত্তা —
পায় না বৃদ্ধি বা ক্ষয়; জন্মে না, মরে না;
একবার অস্তিত্ব সম্ভব হ'লে কোনো কালে ঘটে না বিলয়;
যার মুখগহ্বরে অনন্তকাল ধ'রে
যুগপৎ উপস্থিত বর্তমান, অতীত ও ভাবীকাল,
জড়, প্রাণ, জীবিত, মৃতেরা।
আর সেই সত্তা যেন —
(মৃদ হেসে)
আমি!

কৃষ্ণের এই সংহার ও সংহারক চৈতন্য কবিত্বময়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো তা স্থূল নয়, বক্র নয়, এক জীবনসন্ধিৎসু দার্শনিকের প্রলাপের মতো অভ্রান্ত তাঁর উপলব্ধি। *কালসন্ধ্যা* নাটকে ব্যাসদেবের পূর্বে একমাত্র তিনিই মূর্তিমান কাল হয়ে তার স্বরূপ ব্যক্ত করেন। কাল স্থির নয়, যা এই মুহূর্ত; তাই পরবর্তী মুহূর্তে বিলীন হয়। মৃত্যুর জন্য শোক তাই অনর্থক। কারণ কৃষ্ণের উপলব্ধিতে —

কৃষ্ণ

জন্ম থেকে সকলেই মৃত, চিরকাল সকলেই মৃত,
জীবিত ও মৃতে কোনো ভেদ নেই।

গতি, আবর্তন, পুনরাবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় জীবন ও মৃত্যু স্বাভাবিক। মৃত্যু বা ধ্বংসও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। কারণ, তা না হলে জীবনের স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়, ইতিহাস পূর্ণ হয় না, ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দ্বারকাবাসী ভেবেছিল প্রলয়ের অবসান হয়েছে। কিন্তু ধ্বংস ও জীবন চক্রক্রমিক নিয়মে পুনরাবৃত্ত। দ্বারকাপুরী নিমজ্জনের মধ্য

দিয়ে একটি সম্পূর্ণ সভ্যতা বিলীন হয়ে যায়; পূর্ণ হয় কালের ঘূর্ণন। তবু কেউ বেঁচে থাকে, কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকে, যা সভ্যতাকে পুনর্জন্ম দান করে, ভবিষ্যৎকে ধারণ করে। এভাবে চলে 'ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ এক চিরবর্তমান'। জীবনচক্রের এই আবহমান সত্যটিই বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠা করতে চান *কালসন্ধ্যায়*। সেই দর্শনই উচ্চারিত হয় কৃষ্ণের মুখে —

কৃষ্ণ
ধরো, যদি দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়,
লুপ্ত হয় আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য,
যদি ঘটে প্রলয়, তবুও —
কিছু থাকে — কী থাকে ভাবো।
যদি ভাবো, যদি ভেবে দ্যাখো,
কিংবা যদি কখনো নিজেরই মধ্যে ডুবে যাও, গভীর, গভীরতর,
হয়তো বা অগত্যা উত্তর পাবে —
যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,
যা নেই, তা কখনো ছিলো না।

দ্বারকাপুরীর নিমজ্জন ও কৃষ্ণের ধ্বংস-পুনরুজ্জীবনের এই উপলব্ধির মধ্যে পাশ্চাত্য flood myth বা বন্যা-পুরাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার সম্ভব। বিশ্বপুরাণে বন্যা জন্ম-ধ্বংস-পুনঃসৃষ্টির প্রতীক। কারণ, তা সবকিছু ভাসিয়ে নেয়, শুধু সংরক্ষণ করে নতুন জন্মের বীজ, নতুন সূচনার নিমিত্তে। ব্যাবিলনীয় এবং হিব্রু পুরাণে এই প্রতীক বহুল ব্যবহৃত। ভারতীয় পুরাণে কালী ও মনুর মিথও একই তাৎপর্য বহন করে। বিশ্ব-পুরাণে বন্যা হলো সংহার মূর্তিধারী এক 'মহান মাতা' (Great Mother), যিনি প্লাবনের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, জীবন মৃত্যুনির্ভর; মৃত্যু ছাড়া জন্ম হয় না, পূর্ণ হয় না জীবনবৃত্ত —

> The Deluge cleanses and gives birth to new forms even as it destroys the old. It is the breaking of the eternal waters of the Great Mother — the destructive mother who, whether her name is 'Kali' or 'Demeter', sweeps away the old life but preserves the germ of a new begining. The 'Noah' or the 'Utnapishtim' or the 'Manu' who is spared is the hero of new life who is born of the cosmic waters of the womb of the Great Mother. The flood myth, like the myths of the Destroryer Mother herself, reminds us that life depends on death, that without death there can be no cycle, no birth.[৬]

শুধু দ্বারকাপুরী নয়, স্বয়ং কৃষ্ণ, যিনি সংহারক, তিনিও সংহারের ঊর্ধ্বে নন। ব্যাধের এক তুচ্ছ বাণে তাঁরও অন্তর্ধান ঘটে। কারণ, কালের বিচারে 'মহৎ প্রতিভাও দণ্ডনীয়'। মহাকালের পরাক্রম কেড়ে নেয় অর্জুনের বীর্য, অহংকার। হতবাক পার্থের সামনেই দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় যদু বংশের নারীরা, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আত্মদান করে তাদের কাছে। পরাস্ত, বিধ্বস্ত ও জীবন্মৃত অর্জুন নতশিরে যখন দণ্ডায়মান ব্যাসদেবের সম্মুখে, তখনই নাটকের 'উত্তর কথনে' অর্জুনের প্রতি উপদেশ-সূত্রে ব্যাসদেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সমস্ত সংঘটনের উৎস ও সার —

ব্যাসদেব

তুমি, পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো
অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ।
শেখো :
অনাচার, সদাচার, ধর্মাধর্ম, সব আপতিক।
যা-কিছু সময়োচিত, তাই যথাযথ।
শেখো :
অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,
সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।
শেখো :
কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য-ঘাতকের স্থান-বিনিময়।
অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই, সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।

ব্যাসদেব বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত অর্জুনকে জানান যে, পৃথিবীতে কেউ বা কোনো কিছুই নশ্বর নয়। জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয়-লুপ্তির বাস্তবতায় 'কালের ভূর্জপত্র', যা 'অবিরল নবজাত', যা বেঁচে থাকে পৃথিবীর নতুন, নতুনতর মানুষের স্মৃতিতে ও তাদের সৃষ্টিতে — তাই কেবল সত্য — তাই 'চিরবর্তমান'। পুরাতন কালের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয় নতুন কালের ভিত। *কালসন্ধ্যায়* দ্বারকাপুরী ধ্বংসের পর সেই কালান্তরের যাত্রায় অর্জুনের প্রতি কর্তব্যের নির্দেশনা উচ্চারিত হয় ব্যাসদেবের মুখে —

ব্যাসদেব

ভুলে যাও বীরত্ব, যুদ্ধ ও জয়। এ-মুহূর্তে
আছেন হৃতাবশিষ্ট মহিলারা —
সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,
বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশুগণ।
তাদের স্থাপন করো অভিপ্রেত রাজ্যে বা আশ্রমে
... ...
জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হলো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে —
হয়তো বা আরব্ধ এখনই।
যাত্রা করো, বিদায়।

ব্যাসদেবের নিরাসক্ত উক্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরাতনের গর্ভে জায়মান নতুন সভ্যতার এই ইঙ্গিতই সর্বকালীন ও সার্বজনীন। সেইসাথে বধ্য-ঘাতকের স্থান-বিনিময়ও অনিবার্য। কারণ, নতুন কাল নতুন জন্মের সাথে সাথে বহন করেন আগামী ধ্বংসের জীবাণু। *মহাভারতের* যদুবংশের ধ্বংসের দৃষ্টান্তে নির্মিত এই আবহমান জীবন-সত্যের মিথ-ভাষ্য বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা*।

তিন

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদকৃত *মহাভারতের* 'মৌষলপর্বে'র যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী যথারীতি বৈশম্পায়ণ বর্ণিত এবং জনমেজয়-শ্রুত। *মহাভারতের* এই বিবৃতিধর্মী কাহিনীটি বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা* নাটকে সরলভাবে রূপায়ণ করেননি। যদুবংশের ধ্বংসের কাহিনী ও তার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট *কালসন্ধ্যা* নাটকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে চরিত্রের প্রেক্ষণ, মন্তব্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত। পুরাণের কাহিনীটি নাটকে ধারাবাহিকভাবে চিত্রিত হয়নি বরং পূর্বাপররহিত খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যের সংযোজনে একটি সামগ্রিক আবহে নির্মিত। যেন মহাকালের নিরাসক্ত স্বরূপটিই লক্ষ করা যায় নাটকের আঙ্গিকে। 'টেকনিক'টি নিঃসন্দেহে আধুনিক। *মহাভারতের* কাহিনীটিকে মঞ্চোপযোগী করার লক্ষ্যেই হয়তো নাট্যকার এ ধরনের কাহিনী-বিন্যাসে আগ্রহী হন।

মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপের ছত্রিশ বছর পর সংঘটিত হয় যদুবংশের ধ্বংস। 'মৌষলপর্বে' যদুকুল ধ্বংসের আরেকটি কারণ উল্লেখ রয়েছে, তা হলো — একবার মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও নারদ দ্বারকাপুরীতে এলে সেখানে সারণ, শাম্ব প্রমুখ বীরগণ ক্রীড়াচ্ছলে মুনিদের সাথে কৌতুক ও উপহাস করে। মুনিগণ নিজেদের প্ররোচিত মনে করে কৃষ্ণ-তনয় শাম্বকে এই অভিশাপ দেন যে, শাম্ব-প্রসবিত লৌহময় মূষল-প্রভাবেই যদু, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ বিনাশিত হবে।[৭] কিন্তু *কালসন্ধ্যা* নাটকে গান্ধারীর অভিশাপ কিংবা ব্রহ্মশাপ কেবল প্রতীকী অর্থেই ব্যবহৃত। নাটকের ভূমিকাতেই বুদ্ধদেব বসু জানিয়ে দেন — 'দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহু দূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব-ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।'[৮] বুদ্ধদেব বসু উল্লেখিত সেই আদি সত্যটি আর কিছুই না — মহাকালের বৈনাশিক অভিযানে কালের একটি বৃত্ত পূরণ এবং পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে ধ্বংসসাধন।

কালসন্ধ্যা দুই অঙ্কের একটি নাটক, যার প্রারম্ভে 'পূর্ব কথন' এবং সমাপ্তিতে 'উত্তর কথন' সংযোজিত। 'পূর্ব কথন' অংশটি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধদেব বসুর নাটকীয় নির্মাণ, 'মৌষলপর্বে' এর অস্তিত্ব নেই। এখানে দুই বৃদ্ধ দেশের সংকটোন্মুখ সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্বাপর নিয়ে আলাপরত। তাদের সংলাপে উঠে আসে কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের প্রসঙ্গ, কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সামনীতির কথা, নতুন উদ্যমে নগর গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা, জনগণের স্বস্তি ও সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়। তাদের আকাঙ্ক্ষা একটিই – নশ্বর পৃথিবীতে মৃত্যুর পরও যেন তাদের বংশ-পরম্পরা চলে নির্বিঘ্নে। কিন্তু দ্বারকায় দুর্লক্ষণে তাদের ওই আশা পরিণত হয় শঙ্কায় —

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা ভেবেছিলাম কুরুক্ষেত্রে শোণিতক্ষরণ
এঁকে দেবে দুঃখের অক্ষরে এক মহত্তর শান্তির ইঙ্গিত,
উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে অর্থ পাবে বীভৎস অতীত।
— কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?

মূলত নাট্যকার দুই যাদব বৃদ্ধের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 'মৌষলপর্বে'র পূর্ব ইতিহাসের বিবৃতি দেন, বর্তমান অবস্থাটি সুনির্দিষ্ট করেন এবং সংঘটিতব্য প্রলয়ের ইঙ্গিত দেন, যার উদ্দেশ্য নাটকের ঘটনার ভিত্তি নির্মাণ এবং দর্শকের কৌতূহল উদ্রেক। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *প্রথম পার্থ* নাটকেও এইরূপ দুই বৃদ্ধের কথোপকথনকে অন্তঃপ্রবিষ্ট করেন। বৃদ্ধের সংলাপ বুদ্ধদেব বসু বারবার ব্যবহার করেন এজন্য যে, তারা প্রাচীন, অভিজ্ঞ, সুদীর্ঘ কাল ও তার বিভিন্ন সংঘটনের সাক্ষী। ফলে, অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভারসাম্য তাদের মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব ও যথার্থ। *কালসন্ধ্যা* নাটকে যাদব বৃদ্ধদ্বয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সাক্ষী, তার পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে অবগত এবং তারা যদুবংশ-ধ্বংসের বাস্তবতায়ও বর্তমান। তারাই হতে পারে দুটি সংক্রান্তির প্রত্যক্ষদর্শী। হয়ত এ কারণেই বুদ্ধদেব বসু 'পূর্বকথনে' তাদের সংলাপ ব্যবহার করেন। 'পূর্বরঙ্গে' এই ধরনের সংলাপ-ব্যবহারকে অনেক সমালোচকই গ্রিক নাটকের প্রভাব বলে মনে করেন। অমিয় দেবের মূল্যায়নে —

> এই পর্যায়ের প্রথম রচনা 'কালসন্ধ্যা'র গোড়ায় একটা 'পূর্বরঙ্গ' আছে। বলা বাহুল্য এটা সংস্কৃত পূর্বরঙ্গ নয়, যা নান্দীপূর্ববর্তী। এটা অনেকটা গ্রিক *প্রলোগসের* মতো – দুই যাদব বৃদ্ধ দু'দিক দিয়ে মঞ্চে ঢুকে অনুত্তোলিত যবনিকার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।[৯]

কালসন্ধ্যা নাটকের 'পূর্বরঙ্গের' ক্ষেত্রে এ সাদৃশ্যকল্পনা অমূলক নয়। কারণ, গ্রিক নাট্যকার ইস্কিলাসের *থেবাইয়ের বিরুদ্ধে সাতজন* নামক নাটকের সাথে বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যার* ঘটনার প্রতিসাম্য লক্ষ করেন। সেখানে রাজা আয়দিপৌস-এর অভিশাপে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে মর্মঘাতী যুদ্ধ ও পরস্পর হননের ঘটনা ঘটে, ঠিক যেমন গান্ধারীর অভিশাপে জ্ঞাতি-হননের ঘটনা ঘটে 'মৌষলপর্বে'। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় — 'পড়ে কম্পিত হয়েছি আতঙ্কে ও করুণায় : দুই সহোদর ও এক পিতৃজাত ভ্রাতা, প্রকৃতিদত্ত সবচেয়ে নিকট ও সবচেয়ে হিংসাগর্ভ সম্পর্কে আবদ্ধ, যারা থেবাই নগরীর সিংহদ্বারে পরস্পরকে হত্যা করেছিলেন। আর এখন দেখছি প্রভাসতীর্থে এতেওক্লেস–পলিনাইকেস ভ্রাতারা সংখ্যায় বহুগুণে বর্ধিত হ'লো;'[১০]। *কালসন্ধ্যার* কাহিনীর সাথে গ্রিক নাটকের এই প্রতিসাম্যের সূত্রে ধারণা করা যায় যে, 'পূর্বরঙ্গে' দুই বৃদ্ধের সংলাপে গ্রিক নাটকের প্রভাব থাকা অযৌক্তিক নয়।

কালসন্ধ্যার 'পূর্বরঙ্গে' যে ভয় ও শঙ্কা ইঙ্গিতায়িত, সেটাই বাস্তবায়িত হয় নাট্যাভ্যন্তরে। প্রথম অঙ্কের শুরুতে বুদ্ধদেব বসু বাতায়নপার্শ্বে উপবিষ্ট সত্যভামা-সুভদ্রার প্রেক্ষণ এবং তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বারকাপুরীর দুর্যোগ ও অবক্ষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। সত্যভামা ও সুভদ্রা চরিত্র দুটির সাথে পৌরাণিক 'মৌষলপর্বে'র কোনো সম্পর্ক নেই। নাটকের ঘটমান পরিস্থিতির বিবরণ ও মন্তব্যের প্রয়োজনে চরিত্র দুটিকে কল্পনা করে নেন নাট্যকার। লক্ষণীয় যে, *মহাভারতে* বৃষ্ণি বংশের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত হয় সৌতির মুখে এবং যদিও 'মৌষলপর্বে'র আখ্যান শুরু হয় যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করে, তবু যুধিষ্ঠির এই ধ্বংসের বার্তা পান মাত্র, সমস্ত বিবরণ শোনার জন্য তাকে অর্জুনের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে হয়। আর অর্জুনও দ্বারকাপুরীর সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। ফলে, বুদ্ধদেব বসু নাটকের ঘটনা বিবরণে সৌতি, যুধিষ্ঠির বা অর্জুন কাউকেই ব্যবহার করেন না। তিনি এমন

দুটি চরিত্রকে নির্বাচন করেন, যারা বৃষ্ণিবংশের পুরোনারী, ঘটনার মধ্যে অবস্থান করে তার পূর্বাপর সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব। সত্যভামা ও সুভদ্রা *কালসন্ধ্যা* নাটকের অন্যতম দুটি চরিত্র, কারণ তারাই যদুবংশ ধ্বংসের প্রতিটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, এমনকি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত কালবৃত্ত থেকে বেরিয়ে একটি নতুন কালবৃত্তে অংশগ্রহণ করে তারা। ফলে, যৌক্তিক কারণেই বুদ্ধদেব বসু সত্যভামা ও সুভদ্রার দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেন *কালসন্ধ্যা* নাটকে, তবে সম্পূর্ণ নাটকে নয়, কেবল প্রথম অঙ্কে। কারণ, বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু-ধরনের আবহই বজায় রাখতে চান।

কালসন্ধ্যার প্রথম অঙ্কের শুরুতেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় চিত্রণের মধ্য দিয়ে দ্বারকাপুরীর নিমজ্জনের কার্যকারণটি উপস্থাপিত হয়। *মহাভারতের* 'মৌষলপর্বে' দুর্যোগের পূর্বে এক 'কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরাঃ বিকটাকার কালপুরুষ'কে দ্বারকাপুরীর ঘরে ঘরে বিচরণ করতে দেখা যায়।[১১] বুদ্ধদেব বসু এই অলৌকিক অংশ পরিহার করেন, তার পরিবর্তে 'কালসন্ধ্যা' নাটকে অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় অঙ্কনের মধ্য দিয়ে দ্বারকাপুরীর নিমজ্জনের যৌক্তিক কার্যকারণ উপস্থাপন করেন। বুদ্ধদেব বসু অঙ্কিত এই আকস্মিক বিপর্যয়ের চিত্রটি এমন বাস্তবোচিত যে, মনে হয় পশ্চিম সাগরতীরে অবস্থিত দ্বারকাপুরীতে এইরূপ প্রলয় অস্বাভাবিক নয়, আবার সূক্ষ্মভাবে সেখানে পৌরাণিক প্রতিবেশও অনুভূত হয় — মনে করিয়ে দেয় গান্ধারীর অভিশাপের কথা। সুভদ্রার শঙ্কামিশ্রিত বর্ণনায় —

সুভদ্রা
নেই।
জ্যোতি বা তমিস্রা,
নিদ্রা বা জাগরণ,
আহ্নিক অভ্যাস কিছু নেই।
আকাশে জ্বলছে এক ধিকি ধিকি পিঙ্গল পিণ্ড
করাল দংষ্ট্রা কোন অসুরের মুণ্ড;
জ্বলে নেভে রক্তিম চক্ষু
মলময় তির্যক অনলে,
উদ্দাম জটা থেকে ছুটে যায় অস্থির উল্কা,
জিহ্বা বিলোল, যেন হিংস্র তরক্ষু।

সুভদ্রার এ বর্ণনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* (১৯৩২) কাব্যের 'শিশুতীর্থ' কবিতার সূচনা অংশের কথা —

পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো,
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাতের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে —
ওকি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ রাঙানি!
ওকি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা![১২]

কিংবা অনতিক্ষণ পরেই কামোন্মত্ত, সুরাসক্ত, লুণ্ঠনোদ্যত পরস্পরঘাতী যাদবদের অবক্ষয় চিত্রের অনুরূপ ইঙ্গিতও লক্ষ করা যায় 'শিশুতীর্থে' —

সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয়-ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারীর আর্তস্বরে বিলাপ করে;
বলে 'হায়হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।'
কোনো কামিনী যৌবন মদ বিলাসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে,
বলে — 'কিছুতে কিছু আসে যায় না'।[১৩]

এ সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকটতর হলেও তা সংগত। কারণ, দেশকালভেদে মহাকালের সকল সংক্রান্তির স্বরূপ অভিন্ন প্রায়। '*শিশুতীর্থ*' কবিতায় যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বে মানুষের মধ্যকার পশুশক্তির উদ্বোধনে যে কালসন্ধির সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বারকাপুরীর সামগ্রিক বিপর্যয়ে সেই কালসন্ধ্যারই প্রতিরূপ লক্ষ করা যায়, আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ও এমনকি ভ্রান্তি, জীব ও জড়ের এমনি বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। সভ্যতার সংকটকালের ধর্মই এই।

কালসন্ধ্যার প্রথম অঙ্কে দুর্যোগ-চিত্রের পরই রাজপথে সুরাবিহ্বল 'অভিজাত নর-নারীর নির্বিশেষ কামোন্মত্ততার দৃশ্য চিত্রিত। দ্বারকাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, কুলীন-অকুলীন, সম্ভ্রান্ত-নিম্নজাত সকলেই এই বিলোল আনন্দে উচ্ছৃঙ্খল —

পুরুষেরা

হোক বুড়ি হোক ছুঁড়ি
হোক উগ্রসেনের খুড়ি,
চন্দ্রমুখী বিম্বাধরা
কিংবা হতিশ্রী!
শোন ডাকছি!

রমণীরা

চল ভাঙি ওদের দর্প,
হোক বাঁদর বা কন্দর্প।
আয় সবাই মিলে দামালগুলোর
ভূত ভাগিয়ে দিই
এই আসছি।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, *মহাভারতে* যাদবদের সুরাপান ও কামমত্ততার দৃশ্য সংঘটিত হয় 'প্রভাসতীর্থে'। এ নাটকে বাস্তবসম্মত প্রতিবেশ সৃষ্টির জন্য বুদ্ধদেব বসু তা ঘটিয়েছেন নগরের রাজপথে। আর এই ঘটনায় রূপকান্বিত হয় নাটক রচনাকালীন

কলকাতার ও মধ্যবিত্ত সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বাস্তবতা। সমালোচকের মন্তব্যে — 'পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে ১৯শতকে যে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল, বিশ শতকের ৫০/৬০ দশকে তা' আবার উগ্র হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসু মধ্যবিত্তের সেই বিকার দেখছেন। আরো দেখছেন, বিলাসের মত্ততা আপামর জনগণের মধ্যে।'[১৪] পরবর্তী দৃশ্যে জনতার উল্লাস ও ক্ষোভে রাজপথ কলমুখর। এ অংশ রাজনৈতিক আবহযুক্ত এবং সংলাপ স্লোগানধর্মী। চিরকালের সুবিধাভোগী ক্ষত্রিয় ও রাজন্যশ্রেণি — বসুন্ধরা এবং নারী এককভাবে যাদের ভোগ্য, যাদের অন্যায় ও প্রতিষ্ঠার যূপে বলি হয় শূদ্র, বৈশ্য আর যত নিম্নজাত মানুষ, এই মহাদুর্যোগের দিনে, যখন উচ্চ-নীচ ভেদ লুপ্ত, ন্যায়-অন্যায় নির্ভেদ, তখন চিরকালের বঞ্চিত মানুষগুলো প্রতিবাদে হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ, বাধাহীন —

দলপতি

আমরা ! —

যত বৈশ্য	আর শূদ্র	আর ব্রাত্য,
যত কর্ণ	একলব্য	আর শম্বুক,
যত অন্যায়	যত অবিচার	যত লজ্জা-
চাই প্রতিশোধ!	আজ প্রতিশোধ!	চাই প্রতিশোধ!

যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রতিশোধস্পৃহায় — এরাই হয়ে ওঠে দস্যু, লুণ্ঠনকারী। পুরাণে এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কোনো উল্লেখ নেই। বুদ্ধদেব বসু দ্বারকাপুরীর অবক্ষয়ের কার্যকারণসূত্রে এই বিষয়গুলো কল্পনা করে নেন। এই বিলাস ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেই যাদবদের মধ্যে তৈরি হয় ভ্রান্তি, অধ্যাস, দুঃস্বপ্ন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেখা যায় নানা অসংগতি। যাদব-নারীদের আশঙ্কা-বিহ্বল আর্তিতে —

তৃতীয় স্ত্রীলোক

আমাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রি ভ'রে ইঁদুর
খুঁটে খায় চুল, নখ, গায়ের চামড়া।

চতুর্থ স্ত্রীলোক

স্বপ্নে দেখি, আমাদের বুকের দুধ শুষে নিচ্ছে
বিকট জোঁক, রক্তমুখী বাদুড়;

পুরাণে যে দুর্লক্ষণগুলো অলৌকিকরূপে বিধৃত, বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যায়* সেগুলোকে চিত্রিত করেন মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিরূপে — স্বপ্ন, ভ্রান্ত বা অলীক প্রত্যক্ষণ ও শ্রুতির বিভ্রান্তি (halucination) হিসেবে। বুদ্ধদেব বসুর নাটকে সম্পূর্ণ বিষয়টি একটি স্নায়বিক বিপর্যয়। এসব অসংগতি, অজাচার, বিশৃঙ্খলা ভুলে থাকতে সত্যভামা ও সুভদ্রা অতীতের স্মৃতিচারণ করে। কিন্তু, তার ফলে জেগে ওঠে পুরোনো ক্ষত। সত্যভামার স্মৃতিতে জাগে তার পিতা ভূরিশ্রবার হত্যার নৃশংস অতীত, সুভদ্রার মাতৃহৃদয়কে করুণায় উদ্বেলিত করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত পুত্র অভিমন্যুর স্মৃতি। সত্যভামা ও সুভদ্রা বীভৎস অতীত ভুলে ভুক্তাবশিষ্ট বর্তমানে স্থিতি চায়। প্রকৃতপক্ষে, এ নাটকে সত্যভামা-সুভদ্রা কেবল ঘটনার সূত্রধর কিংবা মন্তব্যকারীই নয়, তাদের দুজনের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অতীতকে বারবার স্পর্শ করতে চান। কারণ, বুদ্ধদেব বসুর নিকট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও

দ্বারকাপুরী ধ্বংস অবিচ্ছেদ্য ঘটনা-পরম্পরা এবং একমাত্র স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়েই সেই যুদ্ধধ্বস্ত অতীতকে বর্তমানে জাগ্রত করা সম্ভব। আর এভাবেই বুদ্ধদেব বসু অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎসঞ্চারী এক প্রবহমান জীবন-অস্তিত্বকে রূপান্বিত করেন।

কালসন্ধ্যার প্রথম অঙ্কের পরবর্তী অংশে যদুবংশের ধ্বংসের প্রত্যক্ষ পটকে স্থগিত রেখে নাট্যকার আবার পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে মঞ্চে। সত্যভামা ও সুভদ্রাকে তিনিই অবগত করেন সাত্যকি ও কৃতবর্মার পরস্পর হত্যার ঘটনা ও যাদবদের জ্ঞাতি-ধ্বংসের বিবরণ। যাদবদের আত্ম-ধ্বংসের চূড়ান্ত ঘটনাটি বুদ্ধদেব বসু উপস্থাপন করেন শৈল্পিক নিরাসক্ত প্রেক্ষণবিন্দু থেকে —

কৃষ্ণ

আমি সেই দৃশ্য দেখে
মাটি থেকে একমুষ্টি এরকা নিলাম তুলে;
স্পর্শ মাত্রে প্রতি তৃণ পরিণত হ'লো
বজ্রতুল্য কঠিন মুষলে:
হ'লো তারা ধাবমান অবিরাম আপন আবেগে।
তুলি তৃণ — যাদবেরা প'ড়ে যায়
কৃষকের উৎকলিত ধানের গুচ্ছের মতো,
অথবা ব্যাধের
বাণবিদ্ধ যেন হংসশ্রেণী।

যাদবদের সংহরণ-চিত্র নাটকে প্রত্যক্ষভাবে ঘটে না, বরং তা বর্ণিত হয় কৃষ্ণের কবিত্বময় দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে, যাকে বলে ঘটনার শীর্ষবিন্দু (Climax), তা এ নাটকে তেমন গুরুতরভাবে অনুভূত নয়। এমনকি রাজপথে যাদবদের মত্ততায় নাটকে যে গতি সঞ্চারিত হতে দেখা যায়, তাও এখানে বিলম্বিত। এর কারণ, প্রলয়রূপী মহাকাল নিরাসক্ত। তার নিকট সৃষ্টি ও ধ্বংস সমার্থক। আর কৃষ্ণই যেহেতু মূর্তিমান কাল এবং স্বহস্তে সংহার করেন তার জ্ঞাতিবর্গকে, সুতরাং, তাঁর চরিত্রের নিরাসক্তি ও দর্শন স্বভাবতই প্রতিফলিত হয় তার সংলাপে — 'দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব;/ যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন-/ সব দ্বন্দ্ব'। এমনকি অর্জুনের প্রতি প্রেরিত তাঁর বার্তাও তেমনি নিরাসক্তিময় — 'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো/ ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মুষ্টিকেরা তাও আর রাখলো না বাকি।' এ নাটকে বুদ্ধদেব বসু কৃষ্ণকে সৃষ্টি করেন দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের সমন্বয়ে। কারণ, 'আদর্শ মানুষের আঁটোসাঁটো ফ্রেমের মধ্যে তিনি ছোট হ'য়ে যান, শতকরা একশো পরিমাণে ঈশ্বর বললেও হ'য়ে পড়েন অবাস্তব ও ভূমিস্পর্শহীন।'[১৫] কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব লক্ষ করা যায় তাঁর সংহারক সত্তায়, অপরদিকে মানবত্ব লক্ষ করা যায় তাঁর ক্লান্তি, নিস্পৃহা ও উদাসীনতায়, — যেন সমস্ত জীবন ক্লান্তিহীন কর্মের পর বিরতিতে উপনীত কৃষ্ণ। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাই অর্জুনের সাথে কথোপকথনরত। দ্বারকাবাসী নির্বংশ হওয়ার ঘটনায় বিচলিত অর্জুনকে কৃষ্ণ তাঁর মহাকাল-স্বরূপ ও দার্শনিক উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন — চেতনার গভীরতল থেকে উঠে আসে তাঁর শব্দাবলি —

কৃষ্ণ
অর্জুন, তুমি ও আমি —
আর যারা আমাদের সঙ্গে ছিলো, শত্রু বা সুহৃদ,
ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দ্রোণ, দুর্যোধন
ভীষ্ম, ভীম, যুধিষ্ঠির, শকুনি, বিদুর,
গান্ধারী, দ্রৌপদী, কুন্তী :
আমরাও ধূসর কাহিনী মাত্র
বিশ্বের বাতাসে ভাসমান
আর তাই অশেষ, আবহমান।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের এই কথোপকথন দৃশ্য *মহাভারতে* নেই। *মহাভারতের* কাহিনী অনুযায়ী, বাসুদেবের মুখে কৃষ্ণের বার্তা পেয়ে অর্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই জরা নামক ব্যাধের তীরে ভূতলশায়িত কৃষ্ণ তাঁর মৃত্যু ঘটান এবং আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করে স্বর্গগমন করেন।[১৬] ফলে, এই দৃশ্যটি বুদ্ধদেব বসুর কল্পিত। এ নাটকে কৃষ্ণের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয় আরো পরে 'উত্তরকথনে' ব্যাসদেবের মুখে। দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ অর্জুনকে তার করণীয় বুঝিয়ে দিয়ে মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হন। গমনরত কৃষ্ণকে দেখায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ এক বৃদ্ধের মতো এবং কৃষ্ণ তিরোহিত হবার সাথে সাথে অর্জুনকেও অনুরূপ এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মতো দেখায়। নাটকের এই বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, প্রতীকী। এখানে কৃষ্ণ তার সমস্ত কর্মের অবসানে ক্লান্ত, জরাক্রান্ত প্রাণ। জরা নামক ব্যাধের বাণে মৃত্যুর পরিবর্তে জরাগ্রস্ত কৃষ্ণের বার্ধক্যজনিত স্বাভাবিক মৃত্যুকে ইঙ্গিত করতে চান বুদ্ধদেব বসু। কারণ, মহাভারতের হিসাব অনুযায়ী যদুকুল ধ্বংসের সময় তাঁর বয়স ছিল শতোত্তর। আর অর্জুনকে হঠাৎ জরাজীর্ণ, লোলচর্ম বৃদ্ধ দেখাবার যে কারণ প্রতীকান্বিত, তা হলো — অর্জুনের সমস্ত বীরত্ব ও কীর্তির নেপথ্য শক্তি ছিলেন কৃষ্ণ। সেই কেশব যখন তাঁকে ত্যাগ করেন, তখনই অর্জুন হয়ে পড়েন নিঃশক্তি, বীর্যশূন্য। ফলে, তাঁকেও জরাগ্রস্ত মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন কৃষ্ণ বা অর্জুনের এ বার্ধক্য বহিস্থ নয়, হৃদয়গত। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অসংখ্য অপরাধের ভারে তাঁরা অবনত, ভগ্নদেহ, জরাগ্রস্ত। 'যে বার্ধক্যে তাঁরা দষ্ট হয়েছেন, সেটা কালানুক্রমিক নয়, চারিত্রিক, ইন্দ্রিয়ের নয়, আত্মার। কেউ নিস্তার পাননি, পেতে পারেন না;'[১৭]। বুদ্ধদেব বসু বাস্তবোচিতভাবে চরিত্রদুটির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়কে প্রতীকান্বিত করেন। কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ার পরের দৃশ্যেই আমরা লক্ষ করি দস্যুদের আক্রমণের সামনে অর্জুন এক নিরুপায় দর্শক, তাদের উপহাসের পাত্র। তাঁর গাণ্ডীব হয়ে ওঠে গুরুভার, শর হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট, তূণ হয় নিঃশেষ। সমস্ত দিব্যাস্ত্রের আহ্বানমন্ত্র তিনি বিস্মৃত হন। তাঁর চোখের সামনে লুণ্ঠিত হয় সব সম্পদ, অপহৃত হয় যাদব নারীরা। কৃষ্ণবিহীন অর্জুন যেন পরিত্যক্ত, জড়সর্বস্ব, জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ —

অর্জুন
একী!
আমি একা — কৃষ্ণ নেই!
অন্তহীন মহাশূন্যে
আমি যেন মজ্জমান — শরীরসর্বস্ব জড়।

শ্রুতি নেই শ্রবণে, দ্যাখেনা চক্ষু, ত্বকে আর নেই স্পর্শবোধ,
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে না —
নির্বাপিত, নষ্টবল, নিঃশেষ অর্জুন,
ধিক তোকে, ধিক তোকে, ধিক শতবার!

দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন ব্যতীত, দস্যুদের আক্রমণ-লুণ্ঠন-উল্লাস এবং অর্জুনের পরাজয়ের অংশটি প্রত্যক্ষভাবে ছন্দ-সহযোগে চিত্রিত। এভাবে সমস্ত নাটকেই কখনো প্রত্যক্ষ সংঘটন, কখনো পরোক্ষ সংলাপ নিয়ন্ত্রণ করে নাটকের গতি ও উত্থান-পতন।

কালসন্ধ্যার 'উত্তর কথনে' সম্মুখে দণ্ডায়মান হৃতসর্বস্ব অর্জুনের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব উচ্চারণ করেন মহাকালের সেই আদিসত্য, যার ইঙ্গিত দ্বারকাপুরীর ধ্বংসকে ছাড়িয়ে বহুদূরপ্রসারী। *মহাভারতে* ব্যাসদেবের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল ক্ষয়হীন, আকারহীন, ধ্বংস ও সৃষ্টিকারী এই মহাকালের নিরাসক্ত চরিত্রের কথা — 'ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ। কাল প্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও অন্যের আজ্ঞাবহ হয়।'[১৮] *মহাভারতে* আদিকবির উপলব্ধি থেকে যে সত্য উচ্চারিত হয়, একালে আধুনিক নাট্যকারের জীবনোপলব্ধির সাথে একীভূতসূত্রে তাই উচ্চারিত হয় *কালসন্ধ্যায়*, বেদব্যাসের মুখে —

ব্যাসদেব

কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু, যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য-ঘাতকের স্থান-বিনিময়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় *কালসন্ধ্যায়* অর্জুন ও কৃষ্ণের পরিণাম এবং নাটকের এই পরিণামী দর্শনকে নিয়তির কাছে নাট্যকারের আত্মসমর্পণ ও ব্যর্থতাবোধের রূপায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বুসর *মহাভারত* বা ইতিহাস পাঠের আংশিকতাকে দায়ী করেন; সর্বোপরি *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* সাথে তুলনাসূত্রে *কালসন্ধ্যাকে* নাট্যকারের দুর্বলতর নির্মাণ বলে মন্তব্য করেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে — '*কালসন্ধ্যায়* সেই অর্থে সভ্যতার বর্তমান চেহারা প্রতিফলিত। আদর্শ এবং আদর্শঋদ্ধ অথরিটির সঙ্গে জনতা ও জননায়কের বিচ্ছেদ, অথরিটির বিবর্ণ প্রস্থান ও নায়কের পতন এ নাটকের প্রধান ঘটনা। ছন্দোবদ্ধ কবিতার সার্বিক ব্যবহারে এর কবিত্ব অধিকতর স্বাবলম্বী। কিন্তু *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* তুলনায় গাঠনিক কবিত্বের বিচারে এ দীন। ঋষ্যশৃঙ্গ যেমন এক শ্রেয়োতর বেলাভূমি পেয়ে গেল, তরঙ্গিণীর সঙ্গে তার সমান্তরলতাও যেমন হয়ে উঠল অন্তর্বন্ধনে যুক্ত — কৃষ্ণ-অর্জুনের বিচ্ছেদে সেরকম কোনো উত্তরণের ইঙ্গিত নেই। এক মহাভবিতব্যকে মেনে নেওয়াই বুঝি বুদ্ধদেব বসুর *মহাভারত* ও ইতিহাস পাঠের ফল। এক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাস পাঠ একাংশিক।'[১৯]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কক্‌তোর *ইনফার্নাল মেসিনের* সাথে তুলনা করে *কালসন্ধ্যায়* সমকালীন আধুনিক বাস্তবতারও অভাব বোধ করেন — 'কিন্তু ককতো যেমন পর্দা সরিয়ে পুরাণের আলো ফেলে পৌঁছে যান আধুনিক বিপন্ন সভ্যতারই মর্মান্তিক প্রতিরূপে — বুদ্ধদেব সেখানে বহির্দ্বারেই থাকলেন স্তব্ধীভূত। তাঁর অর্জুন হতে পারলনা আধুনিক কোনো রাজনৈতিক নায়ক, কৃষ্ণ হতে পারল না আধুনিক অর্থে কোনো তত্ত্ববিশ্বপ্রণেতা।'[২০] কয়েকটি বিষয় লক্ষ করলে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ মন্তব্য যথার্থ বলে গ্রাহ্য হয় না। প্রথমত, নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, বরং বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যায়* মহাকালের এক ধারাবাহিক কৃত্যকে অবলম্বন করেন, যা বাস্তবাধিক বাস্তব, সত্য অপেক্ষা সত্য, অমোঘ, অলঙ্ঘনীয়। মহাকালের এই ভাঙাগড়াকে বুদ্ধদেব বসু 'নিয়তি' বলেই মনে করেন না, বরং এক অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক বাস্তবতা বলে গণ্য করেন এবং ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে, পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে এই ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। প্রথম অঙ্কে কৃষ্ণের মুখে সেই কথাই উচ্চারিত হয় —

কৃষ্ণ
জেনো এই ধ্বংস — এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এল বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।

ফলে, যেহেতু এই কালগ্রাস প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও কার্যকারণেরই নামান্তর, সেহেতু *কালসন্ধ্যায়* কৃষ্ণের অন্তর্ধান 'অথরিটির বিবর্ণ প্রস্থান' নয়, বরং সত্যোপলব্ধিজাত নিরাসক্তি থেকে স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রান্তি। আর অর্জুনের যুদ্ধ ও পরাভব নিয়তির বিরুদ্ধে নয়, এই প্রবল পরাক্রম কালের বিরুদ্ধে তা মূঢ় অর্জুনের আস্ফালন মাত্র। অর্জুন মূঢ়, পরাজিত, কারণ কালবিপর্যয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ — কালপ্রবাহে সকলেই যে একদিন স্মৃতি হতে বাধ্য, বীরত্ব-মহত্ত্ব সমস্ত কিছুই যে সেখানে আপেক্ষিক — এ সম্পর্কে তিনি অজ্ঞান। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সাপেক্ষে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়,তা হলো *কালসন্ধ্যায়* অর্জুন কিন্তু নায়ক নন, বরং এটি তাঁর নায়কত্বের নির্মোক উন্মোচন পর্ব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং অসংখ্য বীরোচিত কর্মের জন্য নন্দিত অর্জুন আসলে ছিলেন কৃষ্ণের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। কৃষ্ণ তাঁকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। নায়ক দূরের কথা, বুদ্ধদেব বসু অর্জুন সম্পর্কে প্রথম থেকেই সংশয় পোষণ করেন। কারণ যুগ যুগ ধরে মহাবীর বলে খ্যাত অর্জুনের ঐশ্বর্যের অন্তরালে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সীমাহীন দারিদ্র্য। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় —

> তিনি (অর্জুন) কৃষ্ণের এক ক্রীড়নক মাত্র, কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের একটি উপলক্ষ শুধু, — তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর একটিও উপার্জিত নয়, উপহার প্রাপ্ত; তার মুকুটের উজ্জ্বলতম সব রত্নই কৃষ্ণের দ্বারা সন্নিবিষ্ট হয়েছিলো।[২১]

বুদ্ধদেব বসুর বিচারে অর্জুন কৃষ্ণের কূট কৃপাধন্য, দৈবপক্ষপাতপুষ্ট একটি নির্বীর্য চরিত্র ছাড়া কিছু নয়। তিনি মনে করেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে কৃষ্ণ কেবল অর্জুনের সারথিই ছিলেন না, ব্যাপক অর্থে, পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত যুদ্ধেই সারথ্য করেন তিনি, মাধ্যম হিসেবে 'ভৃত্যের মতো' ব্যবহার করেন অর্জুনকে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর অর্জুনের বীরত্ব ক্ষমতা

সমস্ত কিছুর নিঃস্বতা ঘটিয়ে তাকে পতনের মুখে নিক্ষেপ করে চলে যান। অথচ, সারথির এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বোঝার মতো ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। অর্জুনের এই মূঢ়তা ও নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধদেব বসু ক্ষমাহীন বিদ্রূপে উপর্যুপরি বিদ্ধ করেন — মহাভারতের এই অজেয় বীরকে তুলনা করেন বুদ্ধিশূন্য 'বালিকা বধূ'র সঙ্গে — 'রবীন্দ্রনাথের বালিকাবধূর মতোই বুদ্ধিহীন, তিনি যেন ধরে নিয়েছিলেন এই মধুর খেলাই চলবে চিরকাল'।[২২] আর সেজন্যই *মহারভারতের* 'শল্যপর্ব' থেকে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব যেমন খণ্ডিত, অর্জুনের বীরত্বও তেমনি অসার। *কালসন্ধ্যার* দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বে সেই সত্যই অবহিত করে যান অর্জুনকে —

কৃষ্ণ

মনে হয় কয়েক মুহূর্ত শুধু,
কিংবা বহুকাল
চিরকাল ধ'রে আমি
ছিলাম তোমার সঙ্গে — লক্ষ্য বা অলক্ষণীয়:
পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে, খাণ্ডবদাহনে
কুরুক্ষেত্রে, স্বর্গে, মর্ত্যে, বনবাসে, সংহারে, বিজয়ে
এমনকি পানে, স্নানে, ভোজনে, বিশ্রম্ভালাপে,
এমনকি বাসরশয্যায়।
মনে হয় তোমার জন্য আমি
বলি দিয়েছিলাম কর্ণকে; আর একলব্যের ঘাতক,
তাও আমি — দ্রোণ নন, অন্য কেউ নন।

যেহেতু মহাকাল ক্ষমাহীন এবং কালের বিচারে 'অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়', ফলে কালের নিয়মে প্রকৃত সত্যের উন্মোচনের প্রয়োজনেই 'অথরিটি'র সঙ্গে 'জননায়কে'র বিচ্ছেদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেজন্যই কৃষ্ণ তিরোহিত হওয়ার সাথে সাথে অর্জুন হন হতবীর্য ও নিঃসম্বল, প্রতীকী অর্থে। সুতরাং, অর্জুনকে নায়কোচিত মর্যাদা দান কিংবা নিয়তির বিরুদ্ধে তাঁকে পরাজিত প্রতিপন্ন করা — কোনোটিই বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশ্য নয়। আর অর্জুনকে আধুনিক কোনো 'রাজনৈতিক নায়ক' কিংবা কৃষ্ণকে 'আধুনিক তত্ত্ববিশ্বপ্রণেতা' হিসেবে সৃষ্টি করতে বুদ্ধদেব বসু ব্যর্থ নন, বরং তা তাঁর অভিপ্রায়ই নয়। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, আধুনিক শিল্পীদের সাথে বুদ্ধদেব বসুর মিথ-চেতনা ও মিথ-নির্মাণে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ককতো যেখানে সমকালীন বাস্তবতাকে রূপকান্বিত করার জন্য পুরাণের প্রচ্ছদমাত্র ব্যবহার করেন, সেখানে বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে কেবল আধুনিকতা সৃষ্টি কিংবা সমকালীনতাকে পুরাণের প্রতিরূপকে উপস্থাপনই একমাত্র নয়। বুদ্ধদেব বসু বর্তমান অপেক্ষা চিরত্বে অধিকতর বিশ্বাসী, কারণ তা ত্রিকাল-সঞ্চারী, তাতে সমকালীনতাকেও আশ্রয় করা হয়, ভবিষ্যতেরও নির্দেশনা পাওয়া যায়। কোনো প্রকট আরোপিত আধুনিকতা নয়, বরং বুদ্ধদেব বসু তাঁর *কালসন্ধ্যায়* সেই চিরায়ত মহাকাল-বাস্তবতাকেই অঙ্গীকার করেন। এই মহাকালই *কালসন্ধ্যা* নাটকে যুগপৎ 'নায়ক' এবং 'তত্ত্ববিশ্বপ্রণেতা' — কোনো বিশেষ কালের নয়, চিরকালীন।

চার

কাব্যনাটক যেহেতু ভাষানির্ভর শিল্প, ফলে এর সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সংলাপই ঘটনা, চরিত্র, নাট্যক্রিয়া, মঞ্চ, দর্শক সমস্ত কিছুর মধ্যস্থতাকারী। কাব্যনাটকে সংলাপই নাট্যকারের দর্শন ও শিল্প-প্রতীতির বাহন। সংলাপ, শব্দ-ভাষা এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* অন্যান্য কাব্যনাটকের তুলনায় স্বতন্ত্র-স্বভাবী। গ্রিক নাটকের Epilogueএর অনুসরণে *কালসন্ধ্যার* 'উত্তর-কথনে'র সংলাপ নির্মিত। দুই যাদব বৃদ্ধের মুখে উচ্চারিত সংলাপে ইঙ্গিতায়িত হয় আসন্ন ধ্বংসের অন্তর্জ্ঞান (Intuition) —

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

আমরা জেনেছি বিশ্বে ক্ষয়, বৃদ্ধি পরিবর্তমান,
মৃত্যু আনে নবজন্ম, বার্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব;
কিন্তু আজ মনে হয় কখনো বা ব্যত্যয় সম্ভব,
কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান।

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা ভেবেছিলাম কুরুক্ষেত্রে শোণিতক্ষরণ
এঁকে দেবে দুঃখের অক্ষরে এক মহত্তর শান্তির ইঙ্গিত,
উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে অর্থ পাবে বীভৎস অতীত।
— কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ।

বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপের এই অন্তর্জ্ঞান একদিকে যেমন দ্বারকার আসন্ন প্রলয়কে ইঙ্গিত করে, অপরদিকে তা বুদ্ধদেব বসুর 'সমকালের বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের রূপ এবং সংকট-লগ্নটিকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত করে।'[২৩] দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে ব্যবহৃত — 'চিতার নির্বাণ থেকে জ্ব'লে ওঠে আরেক শ্মশান' চিত্রকল্পটি দ্বারা কুরুক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ থেকে নতুন মৃত্যু ও ধ্বংসের ধারাবাহিকতা চিত্রিত। বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপ ছন্দোবদ্ধ এবং অন্ত্যমিলযুক্ত। 'উত্তরকথনে'র সংলাপের শব্দ-ভাষা গুরু নয়, লঘু নয় — ভবিতব্যের ইঙ্গিতে ঈষৎ শঙ্কাতুর ও আততি-প্রবণ। এ অংশে বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করার মতো — যেমন, 'সানন্দ নিশ্বাস,' 'সরল আশ্বাস' 'ঋদ্ধিময়ী দ্বারকা', 'মহত্তর শান্তি', 'উদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ', 'বীভৎস অতীত' প্রভৃতি। তবে, প্রথম অঙ্কের শুরুতে দ্বারকাপুরীর প্রাকৃতিক দুর্যোগের শব্দ-ভাষ্য নির্মাণে সত্যভামা-সুভদ্রার সংলাপে বিশেষণ-ব্যবহার আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও সাংকেতিক —

সুভদ্রা

অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য!
নভোমণ্ডলে বিশাল ধূম্রপুচ্ছ,
মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা। কিংবা

সত্যভামা

গুরুগুরু মন্দ্র, যেন ভূমিকম্পে
বিদীর্ণ মন্দির, নাগরিক হর্ম্য,
দানবের ধর্ষণে বিহ্বল দিঙনাগ,
উন্মূল যেন অশ্বত্থ।
[অথবা, ১৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সুভদ্রার উক্তিটি দ্রষ্টব্য]

'জায়মান ঝঞ্ঝা', 'অগ্রিম গর্জন', 'বিশাল ধূম্রপুচ্ছ', 'বিদীর্ণ মন্দির', 'বিহ্বল দিঙনাগ' 'পিঙ্গল-পিণ্ড', 'করালদংষ্ট্রা', 'রক্তিমচক্ষু', 'মলময় তির্যক অনল', 'উদ্দাম জটা', 'অস্থির উল্কা', 'বিলোল জিহ্বা', 'হিংস্র তরক্ষু' প্রভৃতি বিশেষণ-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু দ্বারকাপুরীর দুর্যোগের অস্বাভাবিক চিত্র অঙ্কন করেন। 'গুরুগুরু', 'ধিকিধিকি' প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বারা মেঘের গর্জন, সমুদ্রের তর্জন, ভূমিকম্পের কম্পন ও অগ্নিময় আকাশের ধ্বনি ও চিত্র নির্মাণ করেন। চিত্রকল্প-উৎপ্রেক্ষা-উপমায় প্রকৃতির এই রহস্যময় দানবিক চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন। লক্ষণীয় যে, উপর্যুক্ত তিনটি দৃষ্টান্তের মধ্যে তৃতীয়টি সংস্কৃত শব্দবহুল এবং অন্ত্যমিলযুক্ত। *কালসন্ধ্যার* সংলাপ কখনো অন্ত্যমিলযুক্ত কখনো অন্ত্যমিলহীন।

বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যনাটক থেকে *কালসন্ধ্যার* একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বা ভিন্নতা হলো এর ছন্দ-ব্যবহার। বুদ্ধদেব বসু এখানে পাশ্চাত্য ছন্দের অনুকরণে *ফ্রি ভার্স*, বা মিশ্রছন্দের প্রয়োগ ঘটান। মিশ্রছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন — '... তা মিশ্রছন্দ, যাতে একই কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়, কিংবা গদ্য-পদ্য মেশানো থাকে। ছন্দ ব্যবহারের কি অপব্যবহারের স্বাধীনতা আছে ব'লেই এর নাম ফ্রী ভার্স, বাংলায় এর অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ দিতে গেলে শুধু অস্পষ্টতার ক্ষেত্র বাড়ানো হবে, তাছাড়া কিছু লাভ হবে না।'[২৪] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একেই বলেন — 'স্বয়ংবহ ছন্দ'।[২৫] স্বরাঘাত প্রধান, হলন্তাক্ষরবহুল, 'স্প্রাং রিদ্‌ম্' এর এই ছন্দ — তাঁর ভাষায়, 'ধাতুসঙ্কর'।[২৬] গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে 'অর্ধনারীশ্বর মূর্তি' এই মুক্তছন্দের জন্মদাতা হুইটম্যান — যাকে সুধীন্দ্রনাথ বলেন — 'মুমূর্ষু কাব্যের ত্রাণকর্তা'।[২৭] *কালসন্ধ্যা* নাটকে বুদ্ধদেব বসু গদ্যছন্দের সাথে এই মিশ্রছন্দের সংযোজন ঘটান। সুভদ্রা-সত্যভামা-কৃষ্ণ-অর্জুন — এইসব প্রধান চরিত্রের সংলাপ থেকে সাধারণ জনতার মুখের ভাষাকে পৃথক করতে এবং নাটকের ভাব অনুযায়ী নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজনে বুদ্ধদেব বসু এই মিশ্রছন্দ ব্যবহার করেন। যেমন সত্যভামা-সুভদ্রা যখন গদ্যছন্দে কথোপকথনরত, তখন সুরা-বিহ্বল যাদব নরনারীর মত্ততার দৃশ্যটি চিত্রিত করতে বুদ্ধদেব বসু কখনো স্বরবৃত্তে, কখনো মাত্রাবৃত্তে, কখনো একই অংশে স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটান। যেমন —

পুরুষেরা
ডাকছি
তোদের ডাকছি —
যত যাদব কুলস্ত্রী।

রমণীরা
আসছি,
আমরা আসছি —
বোনঝি মাসি ধুমসো রোগা
বৌদি ঠাকুরঝি।

এখানে রমণীদের সংলাপে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই ছন্দে বাঁধা, কিন্তু প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দের সাথে পরের দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দের মিল নেই। একইভাবে —

পুরুষেরা

চলছে
খেলা চলছে
পা টলছে
গা দুলছে
চোখ জ্বলছে
মদ লাস্যে। —
আর ফুলছে
ক্ষণে-ক্ষণে এক পাগল সাগর ফুলছে
হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!

উপরের পঙ্‌ক্তিগুলো স্বরবৃত্তে রচিত, আবার শেষ পঙ্‌ক্তি 'ক্ষণে-ক্ষণে এক পাগল সাগর ফুলছে' — মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সৃষ্ট। মূলত সুরাসক্ত যাদব নরনারীদের উচ্ছৃঙ্খলাকে শব্দায়িত করতে বুদ্ধদেব বসু এই মিশ্রছন্দের ব্যবহার করেন। সত্যভামার সংলাপেই নাট্যকার পুরুষ ও রমণীদের তালমানহীন ছন্দের ইঙ্গিত করেন —

সত্যভামা

শুনছো? ... গান শুনছো?
নেই তাল, নেই মান, মদিরায় উদ্দাম
পুরুষের, রমণীর কণ্ঠ।

শঙ্খ ঘোষ বুদ্ধদেব বসুর অন্তিম পর্বের রচনায়, অর্থাৎ কাব্যনাটকে এই মিশ্রছন্দ ব্যবহারের ইঙ্গিত করেন তাঁর 'ছন্দের বারান্দায়' — "... কিন্তু এখনও-পর্যন্ত শেষ এই পর্যায়ে তারও পরে এক নতুন মাত্রা লাগলো প্রকরণে। কেবল শ্লোকবন্ধ নয়, কবিতার সূচনায় নিয়মিত ছন্দের ধ্বনি ভরে উঠেছে, এখানে, যদিও অল্প-পরেই আবার খুলে নেওয়া হচ্ছে তার জাল। ... বাঁধন এবং খোলার মধ্যপথটুকু আরো কতদূর মসৃণ হতে পারে, হয়তো তারও পরীক্ষা এরপর তাঁর রচনায় দেখতে পাব আমরা। ইতিমধ্যে কেবল এ-পর্যন্ত ধরতে পারছি যে, ফ্রী-ভার্স বা মুক্তছন্দকে তিনি খুঁজতে চান এই বিপরীত সাধনায়, গদ্যকেই থেকে-থেকে আপাত পদ্যের দিকে টান দেবার পরীক্ষায়, 'গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার' এই মিশ্র ধরনে"।[২৮] শুধু ছন্দ নয় *কালসন্ধ্যা* নাটকের এই অংশ শব্দ ব্যবহারেও স্বতন্ত্র। এখানে নাট্যকার সংস্কৃত শব্দের সাথে ব্যবহার করেন প্রচুর কথ্যশব্দ, যা প্রায় মুখের ভাষার কাছাকাছি। যেমন, 'বোনঝি', 'মাসি', 'ঠাকুরঝি', 'বৌদি', 'রঙ্গ', 'শিকলি', 'ছুঁড়ি', 'খুঁড়ি' 'বুড়ি', 'ছোকরা', 'বোকড়া' প্রভৃতি — এমনকি ব্যবহার করেন দু'একটি স্ল্যাং শব্দও। যেমন : 'ধুমসো' 'মিন্সে' ইত্যাদি।

পুরুষ-রমণীদের সংলাপ-দৃশ্যের পর জনতার অংশগ্রহণে রাজপথে অনুষ্ঠিত দৃশ্যটির সংলাপ রাজনৈতিক আবহে স্লোগানধর্মী —

জনতার উগ্রকণ্ঠ

(নেপথ্যে)
নিপাত যাক, নিপাত যাক;
পাপিষ্ঠেরা নিপাত যাক!

...

দলপতি

ধ্বংস হোক ! ধ্বংস হোক !

অন্যেরা

(সমস্বরে)
পাপিষ্ঠ সব রাজন্যদের
ধ্বংস হোক!

প্রথম অঙ্কে দলপতি ও নগরের মদমত্তা নরনারীদের কেন্দ্র করে নির্মিত অপর দুটি দৃশ্যও লঘুছন্দে রচিত এবং এখানেও সংস্কৃত শব্দের সাথে কথ্য শব্দের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। যেমন —

চতুর্থ পুরুষ

ঢাল কণ্ঠে ধান্যেশ্বরী, টান অঙ্কে কামেশ্বরীকে।

তৃতীয় পুরুষ

না, না! – আর ধান্যেশ্বরী নয়।
এবার সীধু, মধু, কোহলে হবো মগ্ন।

দলপতি

আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছাই ঈশ্বর।

দ্বিতীয় পুরুষ

আমাদের বৌগুলো সব জাউ পান্তা, ধ'রে আন
ওদের একঝাঁক গনগনে জোয়ান কিঙ্করী —
যেন লঙ্কা ঘি লবণ মাখা তপ্ত নবান্ন।

তৃতীয় পুরুষ

না, না! কিঙ্করী কেন? আর কিঙ্করী কেন?
এবার বিশুদ্ধ আর্যনারী — লেলিহান।
বাসুদেবের নাথনি আছে অগুনতি।'

জনতার ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাদের জীবনের অনুষঙ্গ — 'ধান্যেশ্বরী', 'জাউ পান্তা', 'লঙ্কা ঘি লবণমাখা তপ্ত নবান্ন', 'স্নিগ্ধ তাল', 'সজল তালশাঁস' প্রভৃতি — এমনকি প্রবাদ-প্রবচনও, যেমন- 'আজ ঠগ বাছতে ভূ-ভারতে উজাড় হবে গাঁ!', কিংবা নারীদের আর্তস্বরের সংলাপে লৌকিক দেবীদের অনুষঙ্গ — 'মা ষষ্ঠী বাঁচাও! মা লক্ষ্মী বাঁচাও! মা দুর্গা বাঁচাও!' বুদ্ধদেব বসু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং *অনাম্নী অঙ্গনায়* কিছু কিছু লোকজ শব্দের ব্যবহার করেন, কিন্তু, তা *কালসন্ধ্যার* মতো এত বেশি নয়। তবে কথ্যভাষা এবং পদ্যছন্দ *কালসন্ধ্যায়* একটি আরেকটির পরিপূরক হয়ে *ওঠে*। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভাষায় — "*কালসন্ধ্যায়* কথ্যভাষার চাল আর ছন্দের চালের সাযুজ্য নাটককে এগিয়ে নিয়ে যায়। কথ্যস্রোতে যে উপভোগ্য ঝাঁকুনি (jerk), যে আকস্মিক মোড়ফেরা লক্ষ করি, কাব্যনাটকের চরিত্র পাত্রদের মুখের ভাষাতে কাব্যছন্দ তাকে অমান্য করেনি।"[২৯]

তবে পুরাণের অনুসরণে দ্বারকাপুরীর মানুষের দুঃস্বপ্ন-ভ্রান্তি-অধ্যাসকে চিত্রিত করতে নাটকে বুদ্ধদেব বসু স্ত্রীলোকদের যে সংলাপ নির্মাণ করেন, তা অনেকাংশে সম্প্রকাশবাদী (expressionistic) —

তৃতীয় স্ত্রীলোক

আমাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রি ভ'রে ইঁদুর
খুঁটে খায় চুল, নখ, গায়ের চামড়া।'

চতুর্থ স্ত্রীলোক

স্বপ্নে দেখি আমাদের বুকের দুধ শুষে নিচ্ছে
বিকট জোঁক, রক্তমুখী বাদুড় ;

পঞ্চম স্ত্রীলোক

আর দেখ লক্ষ কৃমিকীট আমাদের অন্নে।'

আবার মদের ভাঁড় হাতে প্রহরীদ্বয়ের সংলাপে নাট্যকার ব্যবহার করেন সংস্কৃত শব্দ –

প্রথম প্রহরী

(ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিবে)
চেয়ে দ্যাখ — চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ
ওদের কতনা ছিলো ভোগ্য :
মৃগয়ার উল্লাস, যজ্ঞের সৌরভ,
রণক্ষেত্রে জয়লক্ষ্মী
প্রণয়িনী বনিতার অঙ্ক
এবং দীপ্তিশালী সন্তান,
মধুর স্তোত্রপাঠে মিশ্রিত প্রভাতের তন্দ্রা
এবং নৃত্যে-গীতে মন্দ্রিত সন্ধ্যার মন্দির —
যা-কিছু উৎসাহিত করে মরজীবনে।
অথচ ওরাই আজ শেষ পর্যন্ত
চীৎকৃত বায়ুবেগে বলছে :
ধ্বংসের মতো আর সুখ নেই।

এই নাটকে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে *কোরাসের* মতো করে 'পুরুষ-রমণীর সংলাপ', 'জনতার সংলাপ', 'স্ত্রীলোকদের সংলাপ', 'প্রহরীদের সংলাপ' নির্মাণ করেন বুদ্ধদেব বসু এবং আলাদা আলাদা শব্দ, ছন্দ ও ভঙ্গি প্রয়োগ করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কোরাসের চরিত্র এবং তাদের উদ্দেশ্যকে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করে দেন। আবার সব দৃশ্য মিলে দ্বারকাপুরীর অবক্ষয় চিত্রের পুরিপূর্ণ রূপটি পরিস্ফুট করে তোলেন। রীতিটা অনেকটা কোলাজধর্মী। ডক্টর কণিকা সাহার মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত — "নাটকের চরিত্রাবলী একই ভাববৃত্তের অন্তর্গত, তাই তাদের অভিজ্ঞতা এক হয়েও প্রকাশে বহু। তাদের বাচনভঙ্গি

আলাদা, কণ্ঠস্বর আলাদা — যা তাদের আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। তারা নানাভাবে চিত্রিত হলেও তার ভিতর থেকে জেগে উঠেছে এক সুর।"[৩০]

সত্যভামা ও সুভদ্রা যেহেতু অভিজাত চরিত্র, ফলে তাদের সংলাপ স্বভাবতই মার্জিত এবং গদ্যছন্দে নির্বাচিত শব্দ ব্যবহারে সৃষ্ট — তাতে কখনো শঙ্কা, কখনো ধিক্কার, কখনো রোমন্থন, কখনো সম্ভাবনা, কখনো হতাশার ভাব ব্যক্ত হয়। যেমন —

সত্যভামা

সুভদ্রা, আমার মন অন্য কথা বলে।
অকস্মাৎ দেখি যেন রশ্মিরেখা, যা এখনো দিগন্তে লুকোনো।
জানো তো, যখন রাত্রি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অমায় মগ্ন,
তখনই নূতন উষা আসন্ন, প্রস্তুত।

সুভদ্রা

আমি দেখি দ্বারকায় সর্বনাশ উড়িয়েছে ধ্বজা,
উন্মাদ রাজন্যকুল, আশঙ্কায় বিহ্বল জনতা,
পঞ্চভূত উতরোল, চরাচরে ওঠে প্রতিবাদ।

কখনো কখনো তাদের সংলাপে ব্যক্ত হয় জীবন সম্পর্কে সাধারণ দর্শন। যেমন—

সুভদ্রা

কে আছে এমন দুঃখী, যে নয় অন্তরতলে জীবনভিক্ষুক?

সত্যভামা

অশ্রুময় মর্ত্যলোক, তবু জীব নিরন্তর আশায় উৎসুক।
কিংবা

সুভদ্রা

আমাদের সব সুখ — অন্তরালে বয়ে যায় অশ্রুর প্লাবন।

সত্যভামা

জ্বলে প্রেম আত্মভুক : লালসায়, বিচ্ছেদের তীব্র তাপে, ঈর্ষার জ্বালায়

সুভদ্রা

কখনো বোঝেনা কেউ কোন গুপ্ত ছিদ্রপথে যৌবন পালায়।

সত্যভামা সুভদ্রার অন্ত্যমিলযুক্ত এই সংলাপ-পরম্পরার সাথে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সাদৃশ্য লক্ষ করেন গ্রিক ট্র্যাজিডির Stichomythia আঙ্গিকরীতির'।[৩১] সত্যভামা-সুভদ্রার সংলাপে অলংকারের আরো অনেক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় :

সুভদ্রা

জনগণ ছোটে উদ্‌ভ্রান্ত,
আর্তি ও আক্রোশে ফুঁপে ওঠে গর্জন,
বাত্যাচালিত যেন বহ্নি অশান্ত।

রাজপথের উদ্দেশে ছুটে চলা সুরামত্ত বিশৃঙ্খল জনতার সাদৃশ্যে সুভদ্রা তার সংলাপে এ উৎপ্রেক্ষাটি উল্লেখ করে। সত্যভামার সংলাপেও ব্যবহৃত হয় উপমা —

সত্যভামা
সুভদ্রা, মাভৈ।
ঐ তিনি আসছেন ।
মুখশ্রী উদ্বেগহীন,
ধীর শান্ত পদক্ষেপ —
সুন্দর চিরকিশোর, নির্মেদ, শ্যামল,
বসন্তের হরিৎ ভূর্জের মতো কান্তিমান:
তুমি যাঁর ভগ্নি, আর আমি যাঁর মানিনী বনিতা।

কালসন্ধ্যা নাটকে বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনের ধারক চরিত্র কৃষ্ণ। কাব্যনাটকে "যদিও সমস্ত চরিত্রের মধ্যে অপক্ষপাত স্রষ্টার মতো বিরাজ করা তাঁর (নাট্যকারের) কর্তব্য, তবুও কোনো কোনো সময় যে চরিত্র নাটকের সত্তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে আলোয় টেনে বের করে, সেই সমস্ত চরিত্রের মুখের কথার সঙ্গে নাট্যকারের নিজের কথা যেন দ্বৈতকণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে। কারণ কাব্যনাট্যকার শুধু বহুরূপী স্রষ্টা নন, তিনি কবি, তিনি দ্রষ্টা। পরিস্থিতি-পরিবেশ অনুযায়ী, চরিত্রসঙ্গতি বজায় রেখে সংলাপের বাক্যপুঞ্জে একটি প্রাথমিক অর্থ থাকে, অন্যদিকে নাট্যকারের নিজের তরফ থেকে সেই একই বাক্যপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তিনি সঞ্চারিত করে দেন কোনো স্বতন্ত্র মহত্তর ব্যঞ্জনা।"[৩২] *কালসন্ধ্যায়* বুদ্ধদেব বসু কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে, তার সংলাপের মধ্য দিয়ে মহাকালের বৈনাশিক সত্তা ও জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের দর্শনকে ব্যক্ত করেন। কৃষ্ণের সংলাপ তাই গূঢ় ও প্রতীকার্থক—

কৃষ্ণ
... এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোষ্ট্রাহত জলের কম্পন শুধু।
জেনো, যারা ছিলেন বিশ্রুত বীর, তারা অনাবশ্যক এখন,
তাই প্রত্যাহৃত।
জেনো, এই ধ্বংস — এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এলো বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।

অর্জুনের উদ্দেশে কৃষ্ণ-প্রেরিত বার্তাও প্রতীকী তাৎপর্যময় — 'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো, ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মুষিকেরা তাও আর রাখল না বাকি।' কৃষ্ণের সংলাপে প্রতিফলিত হয় তার স্বভাবসুলভ নিরাসক্তি। তবে, কৃষ্ণের মুখে যদুবংশের ধ্বংসের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ। ক্রমবিস্তারিত দাবাগ্নির চিত্রকল্পে কৃষ্ণ বর্ণনা করেন যদুবংশের হনন-প্রতিহননের ঘটনা —

কৃষ্ণ
যে মুহূর্তে সাত্যকি হঠাৎ রোষে বুদ্ধিভ্রষ্ট
অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন,

সেই ক্ষণ থেকে এক অনল বিস্তীর্ণ হ'লো
সবর্ভুক উৎসাহে রক্তিম,
জন থেকে জনান্তরে, তৃণ থেকে তৃণান্তরে যেন।

জ্ঞাতি-পতনের ঘটনা বর্ণনায় কৃষ্ণ ব্যবহার করেন অসাধারণ সব উৎপ্রেক্ষা ও উপমাগুচ্ছ—

কৃষ্ণ
হত শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ
ইত্যাদি জ্ঞাতিরা — দ্রুত — পরস্পর কিংবা যুগপৎ —
যেন ঝরে শুকনো পাতা অবিরল চৈত্রের বাতাসে,
অথবা ঝঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম।

… …

তুলি তৃণ — যাদবেরা পড়ে যায়
কৃষকের উৎকলিত ধানের গুচ্ছের মতো,
অথবা ব্যাধের
বাণবিদ্ধ যেন হংসশ্রেণী

যাদব-নারীদের সংলাপে দ্বারকাপুরী-নিমজ্জনের দৃশ্যটি কবিত্বপূর্ণ, প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বুদ্ধদেব বসু এ অংশে ব্যবহার করেন মালা-চিত্রকল্প (Chain Imagery) — কোনো কোনো অংশ সমাসোক্তি-প্রবণ ও শব্দ-ধ্বনিময় —

দ্বিতীয় নারী
নিমেষে নিমেষে আরো উগ্র, ভয়ংকর
ঐ শোন সিন্ধুর চিৎকার।

তৃতীয় নারী
অশ্বখুরধ্বনি, চক্রের ঘর্ঘর
প্রলয়ের কলরোলে ডুবে যায়।

চতুর্থ নারী
স্বচক্ষে আজ তবে এও হ'লো দেখতে —
সমুদ্র দ্বারকার রাক্ষস।

পঞ্চম নারী
ফেনময়, দম্ভিল, কুৎসিত উল্লাসে
ছুটে আসে উত্তাল বন্যা।

প্রথম নারী
যত যাই, তত আসে নিষ্ঠুর এগিয়ে,
গিলে নেয় উজ্জ্বল নগরী।

দ্বিতীয় নারী
গিলে নেয় উদ্যান, প্রান্তর, লোকালয়,
মুহূর্তে ডোবে জীবজন্তু।

পঞ্চম নারী

ক্রমশ আকাশ, জল হ'য়ে আসে নির্ভেদ,
তরঙ্গ যেন গিরিশৃঙ্গ।

... ...

দ্বিতীয় নারী

এখন শব্দ শোন অশ্বখুরধ্বনি
কানে-কানে বাতাসের নিস্বন।

দ্বিতীয় অঙ্কে দস্যুদের আক্রমণে যাদব-নারীদের অসহায়ত্ব এবং স্বেচ্ছাসমর্পণের দৃশ্য ছন্দে রচিত। নাটকের দৃশ্যান্তরে ভাবগত বৈচিত্র্য সৃষ্টিই এর লক্ষ্য। যাদব নারীদের সংলাপে —

দ্বিতীয় নারী

ঠমক ছাড়, এগিয়ে চল, লজ্জা কী?

তৃতীয় নারী

দুস্য, তোর অস্ত্র হেনে আমায় বাঁচা

চতুর্থ নারী

তার চেয়ে বোন মিন্সেটাকে বাঁদর নাচা।

প্রথম নারী

হে ভগবান রক্ষা করো, হে দয়াময়!

দ্বিতীয় নারী

যা বলিস না, ওরা তেমন কুশ্রীও নয়।

তৃতীয় নারী

বিষ এনে দে, গলায় ঢালি এক্ষুণি

চতুর্থ নারী

ঠমক ছেড়ে হাত মেলা না! লজ্জা কী?

মূলত নাটকীয়তা ও কবিত্বের পরম্পরা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা* নাটকে এই ছন্দ ও ছন্দপাতের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। গদ্যকে ছন্দোময় ও ছন্দকে গদ্যময় করে তোলাই এর লক্ষ্য। নিচের অংশেও সংগত কারণেই তিনি ব্যবহার করেন লোকজ শব্দ, এমনকি অনুসরণ করেন লোকজ ভঙ্গি পর্যন্ত। যেমন —

দস্যু দলপতি

ও বিধবা বৌ
ওলো ওমুক কুলের ঝি
আয় আমাদের সঙ্গে, আবার
হবি ত্রয়োস্ত্রী। কিংবা,

দস্যু দলপতির সংলাপে লক্ষ করা যায় প্রবাদের ব্যবহার —

দস্যু দলপতি

কেন রে যমের ভিটে মাড়াবি,
সাধ্য কী আমাদের তাড়াবি!

অভিজাত চরিত্র হিসেবে অর্জুনের সংলাপে লক্ষ করা যায় সংস্কৃত শব্দাধিক্য। যেমন — দস্যু আক্রান্ত নির্বীর্য, নিঃসহায় অর্জুনের সংলাপ —

অর্জুন

(চোখ খুলে, অর্ধেক উঠে ব'সে)
কেন আর আসে না স্মরণে
সেই দিব্যাস্ত্র, আমার যাতে
অদ্বিতীয় ছিল অধিকার?
শরজাল জ্যামুক্ত বিদ্যুৎ যেন,
অগ্নিগর্ভ অসি,
বজ্রতুল্য দণ্ড ও নারাচ,
পক্ষবাণ পাশ, প্রাস, পরশু, তোমর—
এদের আহ্ববানমন্ত্র —

কালসন্ধ্যা নাটকে কৃষ্ণের মতো ব্যাসদেব চরিত্রটিও বুদ্ধদেব বসুর মুখপাত্র। ফলে 'উত্তরকথনে' ব্যাসদেবের সংলাপ তাৎপর্যপূর্ণ — সংস্কৃত শব্দবহুল, গদ্যছন্দ-রচিত, দার্শনিক দার্ঢ্য ও ওজস্বিতাপূর্ণ —

ব্যাসদেব

শেখো :
কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী, ও শ্মশান,
যা ঘটায় নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস;
আনে যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য — ঘাতকের স্থান-বিনিময়। কিংবা

ব্যাসদেব

এই সব কুশীলব — ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাল-সম্পর্কিত দর্শনকে *মহাভারতের* 'মৌষলপর্বে'র আশ্রয়ে শিল্পিত করেন *কালসন্ধ্যা* নাটকে। 'পূর্বরঙ্গ' ও 'উত্তরকথন'সহ দুই অঙ্কের নাটকটি কাঠামো-বিন্যাসে প্রচলিত ধারার অনুসারী নয়, আধুনিক ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এ নাটকে বুদ্ধদেব বসু 'মৌষলপর্ব'কে নিজের অভিজ্ঞান ও কল্পনা দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেন, সত্যভামা-সুভদ্রার মতো নতুন চরিত্রের সংযোজন করেন, চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অবয়ব নির্মাণ করেন এবং পুরাণের অলৌকিকতা বর্জন করে বাস্তবানুগ প্রতিবেশ ও আবহ তৈরি করেন। দ্বন্দ্ব-সংকট-উত্তরণের প্রচলিত নাট্য কাঠামোয় *কালসন্ধ্যা* নির্মিত নয়, বরং খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যের সংযোজনে এর অন্তর্বয়ন অনেকটা কোলাজধর্মী, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়, বরং মহাকালের

নিরাসক্ত চরিত্রধর্মে নাটকটি অন্তঃস্বভাবে কখনো কখনো ঈষৎ ক্লান্তিকর, বিশেষত কৃষ্ণের উপস্থিতি রয়েছে যেসব অংশে। বুদ্ধদেব বসুর *সংক্রান্তি* নাটকের মতো এ নাটকটি সম্পূর্ণ পরোক্ষভাবে নির্মিত নয়। এখানে যেমন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে পরোক্ষভাবে ঘটনা বর্ণিত হয়, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাকে দৃশ্যমান করে তোলা হয়। যেমন : সত্যভামা, সুভদ্রা কিংবা কৃষ্ণের সংলাপে পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয় যদুকুল ধ্বংসের বৃত্তান্ত, আবার অর্জুন ও অবশিষ্ট দ্বারকাবাসীর প্রতি দস্যুদের আক্রমণের ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত হয়। চরিত্রানুযায়ী সংস্কৃত ও লোকজ শব্দের যথাযথ ব্যবহার, আলংকারিতা, গদ্যছন্দ ও মিশ্রছন্দের সার্থক প্রয়োগে *কালসন্ধ্যা* নাটকের সংলাপ ও শব্দ-ভাষা নিরীক্ষাধর্মী, নতুনত্ব চিহ্নিত। এভাবে কখনো দর্শন, কখনো নাটকীয়তা, কখনো উপলব্ধি, কখনো সংঘটন, কখনো ছন্দ, কখনো বৈতালিক নিরাসক্তিতে *কালসন্ধ্যা* এক বহুবর্ণিল, স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধ শিল্প।

তথ্যসূত্র

১. বুদ্ধদেব বসু, 'মুখবন্ধ', *মহাভারতের কথা*, পৌষ ১৩৯৭, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৮

২. বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকাণ্ডারী', *মহাভারতের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৪. বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা', *কালসন্ধ্যা*, মাঘ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৯

৫. বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকাণ্ডারী', *মহাভারতের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

৬. David Adams Leeming, 'The Flood' *The World of Myth*, 1992, Oxford University press. Inc., p. 43

৭. শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'মৌষলপর্ব', *মহাভারত* (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ১৪১০

৮. বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা', *কালসন্ধ্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৯. অমিয় দেব, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য' (পুনর্মুদ্রণ), 'উত্তরাধিকার', বাংলা একাডেমী সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৯৬

১০. বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকাণ্ডারী', *মহাভারতের কথা*, পৌষ ১৩৯৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

১১. শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'মৌষলপর্ব', *মহাভারত* (বঙ্গানুবাদ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১০

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিশুতীর্থ', *পুনশ্চ*, পৌষ ১৪০৬, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৬৯

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

১৪. তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'যে জীবন মৃত্যুর অধিক : কাব্যনাটক', *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, পৃ. ৯৯

১৫. বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকাণ্ডারী', *মহাভারতের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

১৬. শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মৌষলপর্ব', *মহাভারত* (বঙ্গানুবাদ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১৪

১৭. বুদ্ধদেব বসু, 'নীলচক্ষু নকুল', *মহাভারতের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

১৮. শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মৌষলপর্ব', *মহাভারত* (বঙ্গানুবাদ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১৯

১৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ ছায়া', *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে*, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২১. বুদ্ধদেব বসু, 'ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য : দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য', *মহাভারতের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৪

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

২৩. ড. কণিকা সাহা, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য : উদ্ভব ও বিকাশ*, জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট কলকাতা-৬, পৃ. ১৪৮
২৪. বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা ছন্দ', *সাহিত্যচর্চা*, ফাল্গুন ১৪১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০০
২৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ' কাব্যের মুক্তি' (স্বগত), *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ*, জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৩০
২৬. 'কাব্যের এই ধাতুসঙ্করের নির্মিত আধারটির নামই মুক্তছন্দ – Free verse। তাতে নতুন-পুরাতন সকল বয়সের সুরই ইচ্ছানুসারে মেলানো চলে, অথচ পাত্র ফাটবার কোনও ভয় থাকে না। সে-ছন্দকে উপলক্ষের তাগিদে পদ্যের নিয়মে দরবেশী নৃত্যে নামানো সম্ভব, আবার অবস্থান ঘটলে, গদ্যের অনিয়মিত গতিও তাতে বেখাপ্পা লাগে না। সে সন্ন্যাসীর ভেক নেয়নি বটে, কিন্তু তাই ব'লে যে সময়ে সময়ে গৈরিক পরে না, এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কারের বাহুল্যে তার তিলার্ধ অঙ্গ অনাবৃত নেই।' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'ছন্দমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (কুলায় ও কালপুরুষ), *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১
২৮. শঙ্খ ঘোষ, *ছন্দের বারান্দা, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, মাঘ ১৪০৮, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৪২৫
২৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ-ছায়া', *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে*, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৩০. ড. কণিকা সাহা, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য : উদ্ভব ও বিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫
৩১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ-ছায়া', *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে*, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫
৩২. অশ্রুকুমার সিকদার, 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর ১৯৮৩, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, পৃ. ২৮০